আঁধারে আলোর অন্বেষণ

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

ইংরেজিতে যাকে বলে ‘পার্সোনাল এসে’ অথবা ‘স্কেচ’— অর্থাৎ ব্যক্তিগত গদ্য— তা সব সময় সময়ের সাক্ষ্য বহন করে না, হয়তো তার তা করার দায়ও নেই। যখন করে, ভাবী কালের কাছে ব্যক্তিগত গদ্য হয়ে ওঠে ইতিহাসের দর্পণ। বুদ্ধদেব বসুর (ছবি) *উত্তরতিরিশ* শীর্ষক প্রায়-বিস্মৃত গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে তেমনই এক দর্পণের সন্ধান মিলল। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত বইটি লেখকের প্রথম জীবনে রচিত কুড়িটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। আপাত ভাবে প্রতিটি লেখাই ব্যক্তিগত গদ্য। কিন্তু মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, বেশ কয়েকটি লেখায়— ‘বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট’, ‘ব্ল্যাক-আউট’, ‘জিনিশ’, ‘নব বসন্ত’ ও ‘নোয়াখালি’— লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা ও দৈনন্দিন জীবনের আলেখ্যর সঙ্গে মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর এবং দাঙ্গা অনায়াসে মিলেমিশে প্রতিফলন ঘটেছে এক রক্তাক্ত সময়ের।

‘বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট’ লেখাটি শুরু হয় কলকাতার একটি বড় রাস্তার (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ) উপরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাটে লেখকের দিনযাপনের বর্ণনা দিয়ে। ফ্ল্যাটটি যে-হেতু বড় রাস্তায়, ‘অবিরাম কোলাহল’ লেখককে সহ্য করে চলতে হয়। কখনও এই কোলাহল লেখকের অসহনীয় ঠেকে ঠিকই, কিন্তু বড় রাস্তায় বাসা হওয়ার কিছু সুবিধেও যে আছে, তা জানান তিনি। যেমন? “নাগরিক জীবনের যে একটি অবিশ্রাম জঙ্গমতা আছে, যা এই বড়ো রাস্তাতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান”— তা বারান্দা কিংবা জানলাতে দাঁড়ালেই দেখা যায়। “ট্রাম-বাস্-এর যাওয়া-আসা, মস্ত মসৃণ গর্বিত অটোমবীল... খিটখিটে মেজাজের কটকট-শব্দিত ট্যাক্সি, ফুটপাতে ফুর্তিবাজ যুবকের দল... স্বচ্ছন্দচারিণী আধুনিকার দৃপ্ত ভঙ্গিমা”— উপভোগ্য ‘জীবন্ত চলচ্চিত্র’র এই সমস্ত দৃশ্যে, লেখক বলেন, ‘কৌতুকের উপকরণের অভাব নেই’।

অতুলনীয় ভঙ্গিতে লেখকের পেশ করা সেই কৌতুকের উপকরণের নানা উদাহরণের কথা পড়তে পড়তে যখন ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, তখনই ধাক্কা লাগে এই অংশটিতে পৌঁছে: “এত বছর ধরে এই বড়ো রাস্তায় কত রঙ্গই দেখলাম, কিন্তু নিখরচায় নিজের বাড়িতে বসে সমস্ত দেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো তা কখনো আশা করিনি। সম্প্রতি তা-ই দেখছি। রোদে-বৃষ্টিতে, দিনে-রাত্তিরে, জ্যোছনায়-অন্ধকারে অবিরাম তাদের যাওয়া-আসা, ফুটপাত আচ্ছন্ন। নানা বয়েসের মেয়ে, নানা বয়েসের শিশু, মাঝে দু-একজন বুড়ো। পরনে একটি কাপড়, হাতে একটি ন্যাকরার পুঁটলি।” ব্যক্তিগত গদ্য সহসা রূপান্তরিত হয়ে গেল ইতিহাসের দলিলে— এক মুহূর্তের মধ্যে ‘বড় রাস্তা’র কৌতুকপূর্ণ পরিবেশ থেকে লেখক আমাদের পৌঁছে দিলেন ’৪৩-এর মন্বন্তরের শুরুর দিনগুলিতে। ‘ছোটো ফ্ল্যাট’-এর

বারান্দায়, লেখকের পাশে দাঁড়িয়েই যেন অমরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করি সেই বীভৎস সময়টাকে, যখন “‘মাগো দুটি খেতে দাও, পেট জ্বলে গেলো, মরে গেলাম—’ এই অসহ্য আর্তস্বর বাদলার হাওয়ায় ঝেঁকে ঝেঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে।”

এই যে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ইতিহাসের সহসা ঢুকে পড়া (বা উল্টোটা), এটা প্রবল ভাবে ঘটতে দেখি ‘জিনিশ’ এবং ‘ব্ল্যাক-আউট’ শীর্ষক প্রবন্ধতেও। ‘জিনিশ’-এর শুরুতেই ‘মক্ষিরানী’র (প্রতিভা বসু, সাহিত্যিক ও লেখক-পত্নী) জিনিস সংগ্রহের আকর্ষণ নিয়ে লেখককে অভিযোগ করতে দেখি। সে আকর্ষণ এতই তীব্র যে, “ফেরিওয়ালাদের জন্য বাড়ির দরজা এবং হাতের মুঠো তিনি সর্বদাই খুলে রেখেছেন; ধরমতলার ফুটপাতে চলতে-চলতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত ও চরণ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে...!” লেখক জানান, সুযোগ পেলেই স্ত্রীর বস্তু-সঞ্চয়ী স্বভাবের প্রতি বক্রোক্তি করতে তিনি ছাড়েননি। ঠিক এখানেই সহসা বাঁক বদল করে লেখাটি ইতিহাসের মধ্যে মিশে যায়: “কিন্তু এইবার বুঝি মক্ষিরানীর কাছে আমার... পরাজয়ের দিন এলো। বস্তু সম্বন্ধে আমার অন্ধতার ধন্বন্তরি অযাচিতভাবে দেখা দিয়েছেন।” সেই ধন্বন্তরির নাম বিশ্বযুদ্ধ। যার প্রকোপে মহা-মূল্যস্ফীতি (হাইপার-ইনফ্লেশন) সম্পদকে কাগজে পর্যবসিত করেছিল; কোনও জিনিস, তা সে প্রয়োজনীয় হোক অথবা অপ্রয়োজনীয়, ইচ্ছে করলেই আর কেনার উপায় ছিল না একেবারেই।

‘ব্ল্যাক-আউট’ শীর্ষক লেখাটির দু’টি অংশ। প্রথম অংশটি রচিত ১৯৪১-এ, দ্বিতীয়টি (সংযোজন) পরের বছর। ১৯৪১-এর অংশটি মূলত চল্লিশের দশকে কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের শুরুর দিকে বদলে যাওয়া তাঁর ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ছবি তুলে ধরেন লেখক: “যাক, এতদিনে তবু কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদ উঠলো, ফুটলো অন্ধকার, এতদিনে সম্ভব হলো রকটি সত্যিকারের অন্ধকার ঘরে ঘুমোনো।... আর শুধু কি অন্ধকার!... সন্ধ্যার পর বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটছি— হঠাৎ দেখি, এ কী! এ যে জ্যোছনা!... আমরা যারা কলকাতার কয়েদি, আমাদের বরাত এতদিনে তাহলে খুলল।” কিন্তু ১৯৪২-এর সংযোজনটিতে যখন পড়ি, “কলকাতায়, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণাঞ্চলে, জনসংখ্যা আজকাল এতই কম যে রাত্রি তার আদিম ঐশ্বর্য ফিরে পেয়েছে।... ভালই— কিন্তু এত বেশি ভাল না-হলেও বোধহয় চলতো”, তখন বুঝতে পারি ‘নিষ্প্রদীপতা’ নিয়ে কৌতুক বদলে যাচ্ছে আতঙ্কে, আস্তে আস্তে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে কল্লোলিনী তিলোত্তমার।

ব্যক্তিগত গদ্য যেমন সব সময় ইতিহাসের দর্পণ হয়ে ওঠে না, তেমনই তা, চেষ্টা করলেও, সব সময় বুকের মধ্যে তোলপাড় ফেলে দেয় না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর এই লেখাগুলি সেই কঠিন কাজটিই সম্পন্ন করে অনায়াসে— অসামান্য এই প্রবন্ধগুলিতে ফুটে ওঠা রক্তাক্ত সময়ের কথা পড়তে কষ্ট হয়। একই সঙ্গে ভয়ও করে, কারণ সেগুলিতে আট দশক আগের সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙনের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা আজও, এই ডিজিটাল যুগেও, সমান প্রাসঙ্গিক— পৃথিবী আজও যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়, দরিদ্ররা এখনও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত প্রতিনিয়ত ডুবে যায় হতাশার অতলতায়।

অবশ্য, কষ্ট এবং ভয়ের পাশাপাশি, ঘন অন্ধকারে আলোরও অস্তিত্ব টের পাই যখন ১৯৪২-এ বোমা পড়ার পরও সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা কলকাতার কথা উঠে আসা ‘নব বসন্ত’ প্রবন্ধে পড়ি “ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্কে যদিও মৃতদেহ ছড়ানো, তবু দু-একজন পাত্রপাত্রী কুরুক্ষেত্রের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে, এবং তারাই আবার নতুন করে সংসার পাতে” অথবা “এই রক্তাক্ত ফাল্গুনেও যখন বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাই, এবং বন্ধুবান্ধবদের ঘরে নবজাতকের আবির্ভাবের খবর কানে আসে তখনই বুঝতে পারি... যে আগুনে আমরা সবাই মিলে পুড়ছি, সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়, তা পেরিয়েও আরো কিছু আছে,... এমন কিছু যা চিরন্তন, ধ্বংসহীন...।” পড়তে পড়তে মনে হয়, আশি বছর আগের সেই দুঃসময়ে, সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে, দাঁতে দাঁত চেপে আমরা বেঁচে তো ছিলাম! তা হলে আজই বা পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব!

অর্থনীতি বিভাগ, শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়

■ *দু’টি প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: editpage@abp.in অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।*